তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যাসাগরের গদ্য রচনার সাধারণ পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-

> "মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালী নির্মান করিতে ছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন তাহা বলা কঠিন।"[১]

বিদ্যাসাগর এমন একজন ব্যক্তি যা আজকের দিনে বিরল। তাঁর প্রতি বিস্ময় কে ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি করেছিলেন।

এই বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সন ১২২৭, ১২ ই আশ্বিন, খ্রীষ্টাব্দ ১৮২০, ২৬ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার মেদিনীপুর জেলার বীর সিংহ গ্রামে জন্ম নেন। পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্রের ঠাকুরদা রামজয় তর্কভূষন, পণ্ডিত হিসাবে রামজয়ের খ্যাতি থাকলেও আর্থিক দিক দিয়ে খুব দুর্বল ছিলেন, তাই ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর বাল্যকাল ও শৈশবকাল কাটিয়েছেন দরিদ্রতার মধ্য দিয়েই।

রামজয় এবং তাঁর ভাইদের মধ্যে বনিবনা না থাকার কারণে তিনি গৃহত্যাগ করলে রামজয়ের স্ত্রী দুর্গাদেবী ছেলে মেয়েদের নিয়ে ভীষন অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। দরিদ্রতা, অসহয়তার যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে দুর্গাদেবী ছেলে মেয়েদের নিয়ে পিতৃগৃহে বীর সিংহ গ্রামে চলে যেতে বাধ্য হন। তাই বীরসিংহ গ্রাম ঠাকুরদাসের মাতুলালয় হলেও সে গ্রামই একদিন নিজের দেশে পরিণত হয়। পিতৃগৃহেও দুর্গাদেবী বেশীদিন থাকতে পারেন নি। আত্মীয় স্বজনদের সাথে মতবিরোধের কারণে তিনি সেই গ্রামেই অন্যত্র বাঁশ বেতের ঘর বানিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। দরিদ্রতার জন্য ঠাকুরদাস অতি অল্প বয়সেই অর্থ উপার্জনের জন্য কলকাতায় যেতে বাধ্য হন।

দরিদ্র পিতার ঘরে জন্ম নিয়ে দরিদ্রতার মধ্যে বাল্যকাল ও শৈশব কাল কাটালেও, দরিদ্রতা কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের মন মানসিকতাকে দুর্বল করতে পারে নি, বরং তাঁকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করতে সাহায্য করেছে। ১২৩৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালাভের

উদ্দেশ্যে পিতার সঙ্গে কলকাতায় যান। তার আগে গ্রামের স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কলকাতায় এসে নয় বৎসর বয়সে তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। কলকাতায় পিতা পুত্র দুজনেই বাস করতেন বড় বাজারের ভগবত সিংহের বাড়িতে। সংস্কৃত কলেজে তিনি ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেনীতে ভর্তি হন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন তাই তিনি মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তিও পেয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজের তিনটি বাৎসরিক পরীক্ষায়ই তিনি সফল্য লাভ করেন। ব্যাকরণের পাঠ শেষ করে তিনি ইংরেজিতে পাঠ আরম্ভ করেন। সেখানেও তিনি অতি সন্তোষ জনক ফল লাভ করেন। তার পর শুরু হয় তাঁর সাহিত্য শিক্ষা। ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সাহিত্যে চর্চা করেন। তাঁর সাহিত্য চর্চার গুরু ছিলেন জয়গোপাল তর্কালংকার। তিনি সাহিত্যে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৮৩৫ সালে শুরু হয় তাঁর অলংকার শিক্ষা। অলংকার শিক্ষায় তিনি কৃতি অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের প্রিয় ছাত্র হিসেবে পরিগনিত হন। তাঁর কৃতিত্বের জন্য তিনি অনেক পুরস্কার লাভ করেন। তারপর তিনি বেদান্ত শ্রেণী ও স্মৃতি শ্রেণীতে পড়াশোনা করার সুবাদে হরনাথ তর্কভূষন ও শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে ধন্য হন। স্মৃতি শ্রেণীতে আশাতীত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন তৎসঙ্গে পান নগদ ৮০ হাজার টাকা পুরস্কার। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'হিন্দু ল কমিটি' নামক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কাব্য অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি, জ্যোতিষ এবং ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ পান্ডিত্য অর্জন করেন।

পনেরো বৎসর বয়সে তিনি ক্ষীরপাই নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দিনময়ী দেবীকে বিবাহ করেই তাঁর সংসার জীবনের শুরু।

অতি অল্প বয়সে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে ডিসেম্বর, বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান অধ্যাপক রূপে নিযুক্তি পান। তখন সেই কলেজের সম্পাদক ছিলেন জি. টি. মার্শাল সাহেব এবং মার্শাল সাহেবের অধিক চেষ্টার ফলে ও সুপারিশে তিনি প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। এখানে পাঁচ বৎসর চাকরী করার পর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ লাভ করেন। এই কলেজের শিক্ষা বিভাগের উন্নতির জন্য তিনি একটি রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করলে সম্পাদক রসময় দত্ত একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং দুজনের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। রিপোর্টটি

পেয়ে মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করেন। তাতে রসময় দত্ত আরও ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণে অকারণে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন। বিদ্যাসাগর যখন দেখলেন যে এখানে আর আত্মসম্মান বজায় থাকছে না তখন তিনি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে সহযোগী সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্তি পান এবং ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ওই কলেজের অধ্যক্ষের পদ খালি হলে ওই সালের জানুয়ারী মাসে অধ্যক্ষের পদ পান মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে এবং অধ্যক্ষের পদ পাওয়ার পর তিনি স্বাধীন ভাবে কাজ করার সুযোগ পান। অধ্যক্ষের পদ পাওয়ার পর তিনি বিভিন্ন সংস্কার মূলক কাজ করেন। সে সময় তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যভার গ্রহন করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যভার গ্রহন করে তিনি বিভিন্ন গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতেন এবং বাংলার অশিক্ষা জনিত নানা ঘটনাও তাঁর চোখে পড়ে, স্ত্রীশিক্ষা যে কতটুকু অবহেলিত তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। এভাবেই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংস্কারের দিকে তাঁর মনোভাবকে চালিত করে। তখন তিনি স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিভিন্ন গ্রামে ত্রিশটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন।

উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যকলকাতার কয়েকজন উদ্যোগী ব্যক্তির চেষ্টায় 'ক্যালকাটা ট্রেনিং স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত এবং বিদ্যাসাগরকে এই স্কুলের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করা হয় এবং ক্রমে তিনি প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদকের পদ লাভ করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়টির নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম হয় 'হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট'। শেষের দিকে এখানেই গড়ে ওঠে 'বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়'।

বিদ্যাসাগর ছিলেন বাংলা গদ্যের জনক। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বাংলা গদ্যের যথার্থ শিল্পী বলে সম্মানিত করেছেন। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিদ্যাসাগরের পূণ্যস্মৃতি অর্পন হেতু বলেছেন যে-

> "রত্নাকরের রাম নাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা মরা মরা বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল। এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়ে আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহন করিতে আমাদের অনুরূপ

অধিকার আছে কি না এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।"[২]

সেকালে বাঙালী জীবনের ওপর যে অত্যাচার অনাচার শুরু হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে অসিতকুমার বলেন-

"সম্প্রতি বাঙালী জীবনের উপর দিয়ে যে অপঘাতের স্রোত বয়ে চলেছে, তাতে জাতি হিসেবে একটা ঐশ্বর্যবান সংস্কৃতির বাহক হিসেবে বেচে থাকার নূন্যতম অধিকার ইতিহাস ও ভূগোলের প্রেক্ষাপটে ক্রমেই হারিয়ে যেতে বসেছে। নীতি ও আদর্শের অবক্ষয় জীবন সম্বন্ধে হেডোনিস্টিক ভোগবাদ এবং যে কোন স্থায়ী বোধের বিরুদ্ধে এস্টাব্লিশমেন্টের প্রতিকূল নাস্তিক্যবাদী বৈনাশিকতা পূর্ব প্রত্যন্তবাসী বাংলাভাষী নৃগোষ্ঠীকে ক্ষণভঙ্গবাদী মহাশূন্যতায় নামিয়ে দিচ্ছে। আজকের এই কালপাহাড়ী অবমূল্যায়নের যুগে 'এই চতুর্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায়' একাকী দাঁড়িয়ে আছে। সেই অশেষ কল্যানপ্রদ বিপুল ছায়াবিস্তারী ন্যগ্রোধের বিশালত্ব অনুধাবন করতে পারলে আমাদের মত লতাগুল্মেরা এখনও বেচে যেতে পারে।"[৩]

একাকী মনের জোর নিয়ে বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আর গদ্য ছাড়া যেহেতু কোনো কাজের ভাষা সংযোগের মাধ্যম হতে পারে না তাই তাঁর কাছে বাংলা গদ্যকে বর্ণপোযোগী করে তোলাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক। বিদ্যাসাগরের যে সমস্ত রচনা আমরা পাই তাতে বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনার অনেক পরিচয়ই আমরা পেয়ে থাকি। লেখকের অনুবাদমূলক গ্রন্থও তাঁর রচনাশৈলীর কৌশলে মৌলিক রচনার মতই চিত্ত আকর্ষন করে। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রেও আমরা একই কথা বলতে পারি। বাংলা গদ্য সাহিত্যের সত্বর উন্নতি ও শিক্ষা প্রচারের জন্য মৌলিক রচনা শক্তিকে দমিয়ে রেখে তাঁকে অনুবাদ কার্যে হাত দিতে হয়েছিল। তাঁর রচনার মূল উদ্দেশ্য জন কল্যাণ। কিছু রচনা করে আনন্দ পাওয়ার আকাঙ্খা চাপিয়ে রেখে, যা কিছু অতি সত্বর সমাজ সংস্কারের কাজে লাগবে সে চেষ্টাই বিদ্যাসাগর করেছিলেন। প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি কোনো প্রলোভনে জড়িয়ে

পড়েন নি, তিনি সমাজের কল্যাণের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন-আর সেজন্যই বাংলা ভাষা আজকের এই নব পর্যায়ের সমৃদ্ধ ভাষার মর্যাদা লাভ করেছিল।

বিদ্যাসাগরের বেশীর ভাগ রচনাই অনুবাদমূলক রচনা। ১৮৪৭ থেকে ১৮৯১ সাল পর্যন্ত তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। ১৮৪৭ সালেরও পূর্বে তিনি ভগবতের কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করে 'বাসুদেব চরিত' লিখেছিলেন। ১৮৪৭ সালে হিন্দি পুস্তক 'বৈতালীপচীসী' অনুবাদের মাধ্যমে 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। বইটির দ্বিতীয় সংস্করন প্রচারিত হলে শ্রীরামপুর মিশনারীদের কাছে উৎকৃষ্ট বলে গণ্য হয় এবং তিনি প্রশংসাও পান। এই গ্রন্থ থেকেই বাঙালি সমাজ বাংলা গদ্য রসের আস্বাদ পান। ১৮৫৪ সালে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের অনুবাদে রচনা করেন 'শকুন্তলা'। ১৮৬০ সালে ভবভূতির 'উত্তর চরিত' এবং বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ করেন 'সীতার বনবাস' নামে, সেক্সপীয়রের 'Comedy of Errors' এর অনুবাদ করেন ১৮৬৯ সালে 'ভ্রান্তিবিলাস' নামে। তিনি অনেক গুলো পাঠ্য পুস্তকও অনুবাদ করেছিলেন। যেমন- ১৮৪৮ সালে মার্শম্যানের 'History of Bengal' এর থেকে কয়েকটি অধ্যায় অনুবাদ করে লেখেন 'বাঙ্গাঁলার ইতিহাস'। ১৮৪৯ এ 'জীবনচরিত' ও ১৮৫১ সালে 'বোধদয়' রচনা করেন চেম্বার্সের 'Biographies' ও 'Rudiments of Knowledge' অবলম্বনে। বিদ্যাসাগরের এই অনুবাদমূলক গ্রন্থগুলি মৌলিক গ্রন্থের মতই মর্যাদা সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যাসাগর জানতেন অনুবাদ ছাড়া অতি দ্রুত ভাবে বাংলা গদ্যভাষা ও গদ্য সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি ভাষার বা গদ্যের রূপচর্চার দিকে অগ্রসর না হয়ে অনুবাদের কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর অনুবাদ মূলক রচনাগুলির আক্ষরিক কোনো অনুবাদ করেন নি, করেছেন ভাবানুবাদ, তাই বাঙালীর হৃদয়ে তার স্বকীয়তা ধরা পড়েছে। আমরা দেখতে পাই 'শকুন্তলা' গ্রন্থে শকুন্তলা যখন স্বামীগৃহে যাত্রা করছিলেন সেই চিত্র অঙ্কন করতে বিদ্যাসাগর মহর্ষি কন্ব কে দিয়ে বলিয়েছেন-

> "হে সন্নিহিত তরুগন! যিনি তোমাদের জলসেচন না করিয়া, কদাচ জল পান করিতেন না; যিনি ভূষন প্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ কদাচ, তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময়

উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না; অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা অনুমোদন কর।”[৪]

এই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে আমরা বনবাসিনী শকুন্তলা পতিগৃহে যাত্রা কালে মহর্ষি কন্ব যে কতটুকু মর্মাহত হয়েছেন তার একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা বিদ্যাসাগর আমাদের দিয়েছেন। তাছাড়াও উনিশ শতকীয় যুগপোযোগী করে তুলতে গিয়ে তিনি মূল গ্রন্থের অনেক পরিমার্জন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর স্বভাবতই ছিলেন ভাষাশিল্পের যাদুকর। বাংলা ভাষাকে প্রয়োজনীয় আবরণে আচ্ছাদিতকরে অপরূপ সৌন্দর্য দান করেছেন।

বিদ্যাসাগরের শিক্ষামূলক রচনার মধ্যে ‘বর্ণপরিচয়’ থেকে ‘আখ্যানমঞ্জরী’ শিশু বালক কিশোরদের মধ্যে জ্ঞানের বাতি জ্বলিয়ে তাদের চক্ষুষ্মান করে তুলতে সাহায্য করেছে। বিদ্যাসাগর শিশুদের বর্ণবোধের কথা ভেবেছেন, বালকদের চরিত্র গঠনে সাহায্যের জন্য তিনি ‘চরিত কাহিনী’ ও ‘জ্ঞানগর্ভ’ পুস্তক চালু করেছিলেন। বিদ্যাসাগর জানতেন যে শিশুশিক্ষার যদি উন্নতি সাধন করা না হয় তাহলে কোনো জাতি মনের দিক দিয়ে সাবলম্বী হতে পারবে না। নানাবিধ কার্যের মধ্যদিয়েও তিনি বাংলাদেশের বাল্যশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার কথা ভেবেছেন। কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা নিয়ে বিদ্যাসাগর যতটা গভীর ভাবে ভেবেছেন সে যুগের অন্য কোনো মনীষী সে বিষয়ে ভাবেন নি।

অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে ইংরেজি পুস্তকের অনুবাদ বাংলায় করলেও তা পাঠকের কাছে সহজে বোধগম্য হয়ে ওঠে না, তাই তিনি অনুবাদ কর্মকে স্থগিত রেখে সহজ বাংলায় পুস্তক রচনা করেছেন।

চেম্বার্সের ‘Exemplary Biography’ থেকে কয়েকজন বিদেশী মহিয়ান ব্যক্তির জীবন কথা নিয়ে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ‘জীবন চরিত’ প্রকাশ করেন। বাংলাভাষী ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ উপকারের কথা ভেবে চেম্বার্সের পুস্তক থেকে কয়েকটি চরিত্র যেমন- কোপার্ণিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, হুর্শেল, গ্রোশ্যস লিনিয়ন, ডুবাল, উইলিয়ম জোন্স ও টমাস জেঙ্কিনস এই কটি চরিত্র নিয়ে তিনি জীবন চরিত রচনা করেন। কারণ ছাত্র ছাত্রীদের চরিত্র গঠনের উপযোগী কোনো পাঠ্যপুস্তক তখন ছিল না, যদিও বা কিছুটা ছিল তা ছাত্র ছাত্রীদের চরিত্র গঠনের উপযোগী বলে মনে হয় নি, তাই তিনি চেম্বার্চের

'Biography' থেকে সেই চরিত্রগুলিকে বেছে নিয়েছিলেন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে বলেছেন-

> "এই জীবন চরিতগুলিতে দেখা যাবে বিদ্যাসাগর মূলত বৈজ্ঞানিক ধরনের চরিত্রই বেছে নিয়েছিলেন এবং যারা অদৃষ্টের উপর নির্ভর না করে নিজের চেষ্টার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর তাঁদের জীবন কথা অতি যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করেছিলেন।"[৫]

যে কোনো কোমল হৃদয় বাঙালি এই গ্রন্থখানি পড়লে অবশ্যই চোখের জল ফেলবেন।

বাংলা শিক্ষা প্রচার ও বাংলা স্কুল পাঠশালায় ছাত্রদের জন্য পাঁচ ভাগে শিশুশিক্ষা বিষয়ে প্রাথমিক পুস্তকের কথা ভেবেছেন বিদ্যাসাগর। প্রথম তিনভাগে বর্ণপরিচয়, বানান ও পঠন শিক্ষা, চতুর্থ ভাগে জ্ঞানোদয় সম্বন্ধে একটি বই যার নাম 'বোধদয়' ও পঞ্চম ভাগে "Chamber's Educational Course" অন্তর্গত নীতি পাঠের কয়েকটি অনুবাদ। বোধদয়ের প্রথম সংস্করণ বহির্জগৎ ও মানব জীবন সম্বন্ধীয়, ঈশ্বরের উল্লেখ সেখানে নেই। আর বইটি নানা ইংরেজি পুস্তক হতে সংকলিত, কোনো অনুবাদ নয়। অল্প বয়সের বালক বালিকারা যাতে সহজে বুঝতে পারে তার চেষ্টাই তিনি করেছেন। বাস্তব জীবনে চলার পথে যেটুকু সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তিনি তাই দিতে চেয়েছেন। বোধদয় একটি আদর্শ বাল্যপাঠ।

বিদ্যাসাগর শকুন্তলা অনুবাদের পূর্ব থেকে সংস্কৃত শিক্ষা ও ব্যাকরণ শিক্ষা সহজ করার জন্য 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' অবলম্বন করে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা আরম্ভ করলেন। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে মূল্যবান উদাহরণ নিয়ে 'ঋজুপাঠ' সংকলন করলেন। এগিয়ে যাওয়া ছাত্র এবং যারা ব্যাকরণের সহায়তায় সাহিত্যের পথে অগ্রসর হতে চায় তাদের জন্য চার খন্ডে ব্যাকরণ কৌমূদী প্রনয়ন করেন। শিশুশিক্ষার জন্য তিনি 'বর্ণবোধ' পুস্তকটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন, বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার পথ সুগম করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মফঃস্বলে স্কুল পরিদর্শন কালে পালকিতে বসে বর্ণপরিচয়ের পান্ডুলিপি তৈরি করেছিলেন। বিদ্যাসাগর অতি সতর্কভাবে যুক্ত ব্যঞ্জন-যুক্ত শব্দ বিন্যস্ত করেছিলেন বলে আজ এক শতাব্দীর পরও

যুক্ত ব্যঞ্জনের অতি কঠিন বানান শিশুদের কাছে সহজে আয়ত্ব করা সম্ভব হচ্ছে। ১৮৫৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বিদ্যাসাগরের 'কথামালা' প্রকাশিত হয়। অবলম্বন ছিল ঈশপের গল্প। কথামালার জন্য ঈশপের গল্প বেছে নেওয়ার কারণ ঈশপের গল্পের নীতি উপদেশগুলি অনেকটাই ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী। বিদ্যাসাগর কতগুলি পাশ্চাত্য চরিত্র অনুসরণ করে ১৮৫৬ সালে জুলাই মাসে 'চরিতাবলী' প্রকাশ করেন। চরিতাবলী সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-

> "যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে, বালকদিগের লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহবৃদ্ধি হইতে পারে, এই পুস্তকে তদ্রূপ বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে."[৬]

১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয় 'আখ্যানমঞ্জরী'। প্রথম দুটিভাগে নীতি কথা একটু বেশী পরিমানে থাকলেও তৃতীয় ভাগের আখ্যানগুলি পরিণত বয়সের কিশোরদের জন্য যে রচিত তা সহজে বোঝা যায়। ১৮৫১ সালে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনা করে সংস্কৃত শিক্ষা সুগম করার চেষ্টা করেছিলেন যার দ্বারা বাঙালি ছাত্রদের সহজে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা লাভ হয়।

বাংলা শব্দের অর্থ, পদ ও শব্দকে বাক্যে কীভাবে ব্যবহার করা হবে এসবের উদাহরণ দিয়ে তিনি রচনা করেণ 'শব্দমঞ্জরী' ১৯৬৪ সালে। তিনি এটি সম্পূর্ন করতে পারেন নি, তিনি স্বরবর্ণের শেষ থেকে ব্যঞ্জনবর্ণের নিবৃত্তি পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। এই অভিধানটি যদি শেষ করতে পারতেন তা হলে তা বাঙালি জাতির মহামূল্যবান সম্পদ হতে পারত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা এমন একটি জায়গায় ছিল যা সমাজ সংস্কার এবং সমাজ পুণর্গঠনের জন্য তিনি বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর যে সময়ে জন্ম নিয়েছিলেন সে সময়ের প্রচলিত বিধি নিয়ম নিয়ে, মানুষের মনে সচেতনতা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। এই সব বিধি নিয়মের বাঁধন থেকে বাঙালি, বিশেষ করে হিন্দু সমাজকে মুক্তি দিতে অনেক মনীষী আগ্রহ প্রকাশ করলে বিদ্যাসাগরের মনেও সে আগ্রহের সূচনা হয়। উনিশ শতকে যে সকল সমাজ সংস্কার আন্দোলন ঘটেছিল,

সে সকল আন্দোলনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরও যে জড়িয়ে ছিলেন তা স্বীকার করতেই হবে। টোলের পন্ডিতের ঘরে জন্ম নিয়ে, সংস্কৃত কলেজের পুরানো শিক্ষারীতিতে বড় হয়েও তিনি যে একজন সমাজ সংস্কারক, এই পরিচয়েই তিনি এদেশে পরিচিত ছিলেন। বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ রোধের চেষ্টায় ব্রাহ্মনের সন্তান হয়েও ক্ষত্রিয় মনোভাব নিয়ে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন সমগ্র ভারতে, সে যুগে হোক আর এ যুগে হোক তাঁর জুড়ি মেলে না। নানা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে নানা প্রবন্ধ লিখে তিনি প্রগতিশীলতার প্রতি যে উদারতা দেখিয়েছেন তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে।

১৮৫০ সালে ঠনঠনের কতিপয় যুবক 'সর্বশুভঙ্করী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করার কল্পনা নিয়ে বিদ্যাসাগরের দ্বারস্থ হন। বিদ্যাসাগরের বন্ধু মদনমোহন তর্কালংকারের এই পত্রিকার সঙ্গে যোগসূত্র ছিল। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। এই 'সর্বশুভঙ্করী' পত্রিকার মাধ্যমে 'বাল্যবিবাহে দোষ' নামক প্রবন্ধ প্রকাশের পরই বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার মূলক কাজের শুরু। এটিই তাঁর সমাজ সংস্কার মূলক প্রথম লেখা। বাংলাদেশের একটি পুরনো সামাজিক প্রথা ছিল বাল্যবিবাহ। আর এই প্রথা সেই শতকের সামাজিক জীবনকে বিব্রত করে তুলেছিল। বাল্যবিবাহ বিষয়ে প্রগতিশীল সমাজের অনেক নেতারাও বিরোধিতা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় যদিও বাল্যবিবাহের পক্ষে ছিলেন না, কিন্তু বিল্যবিবাহ সম্পর্কে তিনি কোনো লেখাই লেখেন নি, বা কোনো আন্দোলনও করেন নি। অনেকে বাল্যবিবাহের নামে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে থাকলেও বাল্যবিবাহ যে অতিশয় নির্দয় কাজ তা বিদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে প্রমান করেছেন এবং তার জন্য তিনি কোনো শাস্ত্রের বাধ্যবাধকতায় জড়িয়ে পড়েন নি। বিদ্যাসাগর অতি সরল ভাষায় এবং অসংখ্য যুক্তি দিয়ে বাল্যবিবাহ যে কতটা দুষ্কর্ম তা দেখিয়েছেন এবং বয়স্ক বিবাহের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। বাল্যবিবাহের যে নৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য ও বংশানুগতি সব কিছু বিচার করে তিনি প্রশ্ন করেছেন-

> "অতএব যে বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদিগের এতাদৃশী দুর্দশা ঘটিয়া থাকে, সমূলে তাহার উচ্ছেদ করা কি সর্বতো ভাবে শ্রেয়স্কর নহে?"[৭]

প্রবন্ধটির উপসংহারে তিনি এও দেখিয়েছেন যে বাল্যবিবাহের ফলে দেশে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে সময় পর্যন্ত তিনি বিধবাবিবাহ সম্পর্কে আন্দোলনে নামেন নি। তবে বিধবা জীবন যে কেবল দুঃখের ভার একথা তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে জানিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর বলেছেন বাল্যবিবাহের পক্ষে শাস্ত্র এই নির্দেশ দেয়-

> "অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা দান করিলে পিতামাতার গৌরীদান জন্য পুন্যোদয় হয়, নবম বর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বীদানের ফল লাভ হয়; দশমবর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করলে পরম পবিত্র লোক প্রাপ্ত হয়।"[৮]

এই সমস্ত শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে ফল লাভের আশায় ভবিষ্যৎ বিবেচনা না করে আমাদের দেশের মানুষ বাল্যবিবাহে প্রবিত্ত হন। বিদ্যাসাগর সেই স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশ অতি অবহেলায় উপেক্ষিত করেছেন। বিবাহের আসল উদ্দেশ্য হল পরস্পরের প্রতি প্রণয়। কিন্তু বাল্যকালে বিবাহ হলে বালিকা সেই সুমধুর সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিদ্যাসাগর বলেছেন-

> "মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্যভাব ও আন্তরিকভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদেশীয় বাল-দম্পতিরা পরস্পরের আশায় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্তানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্র পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, একবার অন্যান্য নয়নসঙ্ঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যাপুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখ দুঃখের অনুল্লঙ্ঘণীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্যই অস্মদেশে দাম্পত্য নিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল প্রণয়ী ভর্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহ পরিচারিকা স্বরূপ হইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করেন।"[৯]

বিবাহ নামক যে বন্ধন সে বন্ধন সম্পর্কে শাস্ত্র যে নির্দেশ দেয় সেই নির্দেশের গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে স্বামী স্ত্রী দুজনের প্রণয়ের প্রতিই বিদ্যাসাগর গুরুত্ব দিয়েছেন। অতি অল্প বয়সে বিবাহ হলে সেই বালিকার গর্ভে যে সন্তান আসবে সে সন্তান অনেক সময় গর্ভাবস্থাতেই শেষ হয়ে যায়, আর যদিও বা সে পৃথিবীর আলো দেখতে পায় তবে তার জননী সারাটা জীবন রোগে আক্রান্ত হয় বা মৃত্যুও ঘটতে পারে। সে সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বলেছেন-

> "অনতীত শৈশব জায়াপতি সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহার গর্ভবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণ বিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ট হয়, তাহাকে আর ধাত্রীর অঙ্কশয্যাশায়ী হইতে না হইয়া অনতিবিলম্বেই ভূতধাত্রীর গর্ভশায়ী হইতে হয়।"[১০]

বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন প্রকৃত সমাজ সংস্কারক। তিনি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধকরণ, স্ত্রীলোকের অশিক্ষা, মেয়েকে সম্পত্তির মালিকানা না দেওয়া এই সমস্ত সামাজিক কার্যকলাপের জন্য যে কত নারীর জীবন বিপন্ন তা অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাই তিনি সে সমস্ত কুসংস্কার থেকে নারীকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এ প্রস্তাব যখন বিদ্যাসাগর প্রচারিত করেন তখন তাঁর মনে সন্দেহ ছিল যে এ দেশের লোক এই পুস্তকের নাম শোনা মাত্র এবং তার কারণ বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন ও অশ্রদ্ধার চোখে দেখবেন বা আগ্রহের সহিত পাঠ করবেন না। আশ্চর্যজনক ভাবে এই গ্রন্থ প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকের যে আগ্রহ দেখা গেল তা ভাবনার বাইরে। প্রথম মুদ্রিত দুইশত গ্রন্থ এক সপ্তাহে নিঃশেষ হয়ে যায়। তা দেখে তিনি উৎসাহিত হয়ে আরোও তিন শত গ্রন্থ মুদ্রিত করলে তার অধিকাংশ অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

১৮৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকেই তিনি প্রমান করেন যে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও বৈধ। প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার কয়েক মাস পরে "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" নামে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। যারা বিধবা বিবাহকে অযৌক্তিক

ও শাস্ত্র বিরোধী কাজ বলে তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন তাদের সমুচিত জবাব দেবার জন্য তিনি শাস্ত্র সংহিতা থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে অসাধারণ যুক্তি দিয়ে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি রচনা করেছিলেন।

বিধবাবিবাহ প্রচলনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরকে প্রেরণা দিয়েছিলেন তাঁর মা বাবা দুজনেই। বিদ্যাসাগরের অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মৃতপ্রায় অবস্থায় যখন বাল্যবিবাহ করলেন তখন বিদ্যাসাগর খুব চটে যান সে বালিকার অকাল বৈধব্যের কথা চিন্তা করে তাঁর চোখে জল আসে। তাছাড়াও বিদ্যাসাগরের বয়স যখন ১৩/১৪ তখন তাঁর বাল্যকালের এক সঙ্গিনী অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন, তখন থেকেই বিদ্যাসাগর সংকল্প করেছিলেন যে তিনি বেঁচে থাকাকালীন বিধবাদের জন্য কিছু একটা করবেন যাতে তাদের বৈধব্য-দুঃখ মোচন হয়।

বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের কাজে হাত দেওয়ার আগে বিধবাবিবাহ রোধ নিয়ে অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সে সময়কার লোকাচারের জন্য সে কাজ বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারে নি। কিন্তু বিদ্যাসাগর নানা শাস্ত্র ঘেটে তার প্রমান পাওয়ার চেষ্টা করলেন। বিদ্যাসাগর মনে করতেন বিধবা বিবাহ বাস্তবায়িত করতে পারলে তিনি জীবনের একটি সৎ কর্ম বলে মনে করবেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য তাঁকে অনেক যাতনা সহ্য করতে হয়েছে। এই বিধবাবিবাহ আন্দোলন শুধু শহরে সীমাবদ্ধ না থেকে গ্রামেগঞ্জেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৪৯ সালে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় যে হিন্দু বিধবার বিবাহ নিয়ে প্রাচীন হিন্দুদের মনে কোনো কপটতা থাকলেও, সে সময়ের যুবকরা তাঁর পক্ষে ছিলেন। 'সম্বাদ ভাস্করে'র সম্পাদক গৌরীশংকর বিধবা বিবাহ প্রচলনের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি প্রাচীন হিন্দুদের আহ্বান জানিয়ে বলেন যে–

> "প্রাচীন হিন্দু মহাশয়েরা এই সময়ে শাস্ত্রীয় প্রমানানুসারে নিয়ম বদ্ধ করিয়া যদি বিধবাদিগের বিবাহ প্রচলিত করেন, তবে তাঁহাদিগের বংশাবলীকে উত্তরকালীন আপদ হইতে মুক্ত করিয়া যাইবেন।"[১১]

১৮৫৬ সালে ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়েছিল কিন্তু সঙ্গে জড়িয়েছিল বহু জনগোষ্ঠীর সংগ্রাম। বহুজ্ঞানী গুণীরা এ সংগ্রামে জড়িয়ে থাকলেও বিদ্যাসাগরের কঠোর চেষ্টা ও নেতৃত্বে এই আইন অতি সত্বর প্রচলিত হয়েছিল। রক্ষনশীল সমাজের ভয়ে প্রগতিশীল ব্যক্তিরা এগিয়ে আসতে না পারলেও সেই সব ব্যক্তিদের শুভেচ্ছাই বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলেছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে বলেছেন-

> "বিদ্যসাগর শাস্ত্র, যুক্তি, বাস্তবজ্ঞান প্রয়োগ করে বিধবা বিবাহের বৈধতা প্রমানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এর পূর্বে রামমোহনও সহমরণ নিষেধক প্রস্তাবে এই জাতীয় যুক্তি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমান করতে চেয়েছেন, যুক্তির দ্বারা তাকে প্রতিষ্টিত করতে চেয়েছেন; কিন্তু আসলে তিনি আবেগের দ্বারা মানবপ্রেমের বশীভূত হয়ে বিধবাদের দুঃখ মোচনে অগ্রসর হয়েছিলেন। অবশ্য বিধবা বিবাহ প্রচলিত না হলে সমাজে ব্যভিচার দোষ ও ভ্রুণহত্যাপাপ বাড়বে, বিদ্যাসাগর সামাজিক ও নৈতিক পাপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, গোপনে অনুষ্টিত এই সমস্ত মহা পাপ থেকে বিধবাদের ও সমাজ কে বাঁচাতে হলে বিধবাবিবাহের আশু প্রয়োজনীয়তা তিনি প্রমান করেছেন।"[১২]

বিদ্যাসাগর শুধু বিদ্বান পন্ডিত ছিলেন না, তিনি মনে প্রাণে ছিলেন-একজন সমাজ সংস্কারক, তাই শাস্ত্রীয় বাদানুবাদের গন্ডির মধ্যে থেকে তাঁকে বিধবা বিবাহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয় জেনেও তিনি শাস্ত্রীয় আলোচনার স্তর থেকে ক্রিয়াশীল স্তরে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আইনের সাহায্যে বিধবাবিবাহ প্রচলন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিধবাবিবাহ প্রচার কার্য বিস্যাসাগরের মনের দ্বিধা যখন পুরোপুরি কেটে উঠতে পারেন নি, সে সময় তিনি সমাজের দ্বিতীয় কু-সংস্কার বহুবিবাহ প্রথাকে কেন্দ্র করে দুটি পুস্তক প্রচার করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ প্রথা চলিত থাকাতে

সে সময়ের সমাজ কলুষিত হয়ে পড়েছিল। এই বহুবিবাহ নিবারণের প্রস্তুত কাল খুব দীর্ঘ সময় নিয়েছিল।

সামাজিক প্রথার মূল উপড়ে ফেলা যে কত শক্ত কাজ তা সংস্কার ধর্মীরা তাদের সমাজ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারেন। সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন-

> "যে কোন জাতির সংস্কৃতি নানারকমের সামাজিক প্রথার একটি বিশিষ্ট সন্নিবেশ বা প্যাটার্ন ছাড়া কিছু নয়।"[১৩]

রামমোহনের সময়ও বাংলায় 'ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী' যে ভাবে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন তদ্রুপ বহুবিবাহ ব্যাপারেও তাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন। বিধবা বিবাহ চালু হওয়ার প্রায় দেড় মাস পর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' থেকে একটি পত্র প্রকাশ করা হয়। সে পত্রে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে প্রশংসা জানানো হয়, এবং তাও বলা হয় যে বাংলার নারীদের প্রতি কিছু কর্তব্য এখনও বাকি রয়েছে, তিনি যেন নারী জাতির দুঃখ দুর্দশা দূর করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নেন। কৌলীন্য প্রথা যে মেয়েদের জন্য বড় এক অভিশাপ, সে অভিশাপ থেকে মেয়েদের মুক্ত করতে বিদ্যাসাগর তাঁর অন্য সকল পুস্তক সম্পূর্ন করে নানা শাস্ত্র থেকে প্রাসঙ্গিক কথা উত্থাপন করে দেখিয়ে দেন যে বহুবিবাহ কোনো শাস্ত্রীয় ব্যাপার নয় আর এই প্রথা নিবারণ করলে শাস্ত্রীয় মর্যাদার হানি হবে না। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হল বিদ্যাসাগরের "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব"। এতে তিনি দেখিয়ে দেন মানব ধর্মের উপর আর কোনো ধর্ম নেই। সকল ধর্মের মূলে রয়েছে মানব ধর্ম।

বহুবিবাহ নিয়ে নানা সামজিক মতামত ছিল। একদলের মতে তা শাস্ত্রীয় ব্যাপার, অন্য দলের মতে তা অশাস্ত্রীয়। কিন্তু যারা বহুবিবাহের পক্ষে ছিলেন তাদের মধ্যেও নানা মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। বহুবিবাহ বিষয়ের বিরুদ্ধে যখন জনগনের মতামত বেড়েই চলেছে, তখন রক্ষনশীলরা সজাগ হয়ে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষয়ে যাহাতে কোন আইন পাশ না করা হয় তার জন্য আবেদন জানালে সাথে সাথে বিদ্যাসাগরও একটি পাল্টা আবেদন জানান এবং সেই আবেদনে ধনী দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিত মিলিয়ে হাজার হাজার

মানুষ সই করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে কৌলীন্য প্রথা যে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল তা বিদ্যাসাগর যে বিবাহের তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন তাতে কুলীন ব্রাহ্মনদের বিবাহের সংখ্যার হিসাব পাওয়া যায়।

বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রকাশের পর মৌচাকে লোহার আঘাত হানার মত ঘটনা ঘটল। শুরু হল বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে নানা বাদপ্রতিবাদ। সে সকল প্রতিবাদ অনেক অংশেই অশাস্ত্রকর ও অতি কঠোর। সে সময়ও বিদ্যাসাগর বসে না থেকে সেই বিরোধী আক্রমনের জবাব দিতে গিয়ে প্রথম পুস্তকটি প্রকাশের দুই বছর পর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করলেন, ১৮৭৩ সালে। এই পুস্তকে বিদ্যাসাগর প্রতিবাদীদের সকল যুক্তির অবসান ঘটালেন এবং নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণদের কোন উৎপাদনক্ষম কাজের দায় থাকার কারণে, শুধু কুলবৃত্তি শাস্ত্র দ্বারা ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের আর্থিক দুর্বলতা দেখা দেয়, ফলে তারা বহুবিবাহকেই তাদের আর্থিক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে বেছে নেয়। দারিদ্রতা ও অভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য খুব সহজ একটি রাস্তা ছিল বহুবিবাহ। ভঙ্গকুলীনরা ব্যবসার মত বিবাহ করতে শুরু করেন। বিদ্যাগসার তার বহুবিবাহ পুস্তকের লিখেছেন-

> "এদেশের ভঙ্গকুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী ভুমণ্ডলে নাই। তাঁহারা দয়া, ধর্ম্ম, চক্ষুলজ্জা ও লোকলজ্জায় একেবারে বর্জিত। তাঁহাদের চরিত্র অতি বিচিত্র। চরিত্র বিষয়ে তাঁহাদের উপমা দিবার স্থল নাই। তাঁহারাই তাঁহাদের একমাত্র উপমাস্থল।''[১৪]

বহুবিবাহ নিবারণের ক্ষেত্রে যদিও বিদ্যাসাগর আইন জনিত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিলেন কিন্তু সামাজিক দিক থেকে তিনি সার্থকজনক ফলাফল লাভ করেছিলেন। তাঁর এই বহুবিবাহ নিবারণ জনিত পুস্তকগুলি শিক্ষিত সমাজে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। যারা শাস্ত্রীয় ভাবে বহুবিবাহকে সমর্থন করে আইনের বিরোধিতা করেছিলেন সে জনগোষ্ঠীর

মধ্যে অনেকেই কৌলিন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ যে সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর, একথা সরাসরি যদিও স্বীকার করতে পারেননি কিন্তু মনে মনে একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

অনেকে মনে করেন যে বিদ্যাসাগর হয়তো প্রগতিশীল মনোভাব নিয়ে সমাজ সংস্কারের কাজে হাত বাড়িয়েছিলেন, সেটা কিন্তু ভুলধারণা, বিদ্যাসাগরের মূল প্রেরণা বুদ্ধি ছিল না ছিল একটি কোমলহৃদয়। তিনি মনে করেছিলেন-

> "বহুবিবাহ শাস্ত্রমতে আবশ্যিক কর্তব্য নয়, একথার প্রমান দিলেই বিদ্বজন তাঁর যুক্তি বুঝবেন এবং সমর্থন করবেন।"[১৫]

সমাজ সংস্কার মূলক কাজে তাঁর অন্তর সর্বদা ক্রিয়াশীল ও চঞ্চল। সমাজ সংস্কার মূলক কাজ করতে গিয়ে তাঁকে অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও কটুক্তি শুনতে হয়েছিল। কিন্তু এসমস্ত সাধারণ ব্যঙ্গ বিদ্রুপ কটুক্তি উপেক্ষা করে তিনি তাঁর সাহিত্য রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যদি আরও একটু বেশী সময় দিতে পারতেন তাহলে বাংলা সাহিত্যের সুন্দরতা আরও বৃদ্ধি পেত ও পরিপূর্ণতা লাভ করত।

বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রায় পুরোটাই কেটেছিল অনুবাদ কর্ম, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা প্রচার, বিতর্ক রচনা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে। মানুষের কল্যাণের কাজে এবং জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করাতে তাঁর জীবনে অবসর প্রায় ছিলই না। সাহিত্যের দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে গৌরবের অধিকারী ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগরের তাতে সমান অধিকারই ছিল। বিদ্যাসাগরকে সারাটা জীবন প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে, প্রচার পুস্তকের মধ্যেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় নষ্ট হয়েছে। আর সে কাজটা তিনি করেছেন প্রয়োজনের তাগিদে, তাই তাঁর জীবনের মৌলিক রচনাগুলি তেমন ভাবে পাঠকের মন জয় করতে পারেনি।

বিদ্যাসাগরের মৌলিক পুস্তকের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। কোনো বাঙালির লেখা 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' ১৮৫৩ সালে প্রচার হল, এবং এটিই বাঙালির সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম হতিহাস। ১৮৫৫ সালে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব এর দুটি খন্ড, ১৮৭১ ও ১৮৭৩ সালে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার' নামক দুইটি পুস্তক প্রকাশিত

হয়। স্বরচিত জীবনচরিত 'বিদ্যাসাগর চরিত' ১৮৯১ সালে এবং 'প্রভাবতী সম্ভাষন' ১৮৬৩ সালে (এটা অনুমানিক)। এগুলি সুষ্ঠু সাহিত্যকর্ম বলে অতি সুখপাঠ্য হয়েছে।

১৮৫৩ সালে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' তাঁর স্বাধীন মৌলিক রচনা। এটি তিনি কোনো গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করেন নি। যারা অনুবাদক বিদ্যাসাগরকে চিনে থাকেন তারা এই মৌলিক রচনাগুলির মাধ্যমে অন্য এক বিদ্যাসাগরকে পাবেন। এই গ্রন্থটি এই কারনে বেশী উল্লেখযোগ্য যে এই গ্রন্থের মাধ্যমে প্রথম ভারতীয় ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা করা হয় এবং এটি করেছেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। ১৮৫১ সালে ভারত প্রেমিক জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেবের মৃত্যু হলে তাঁর নামে একটি সোসাইটি প্রস্তুত করা হয়, যার নাম 'বেথুন সোসাইটি'। পাঁচ জন ইংরেজ এবং উনিশজন বাঙ্গালিকে নিয়ে এই সোসাইটি গঠিত হয় তার মধ্যে একজন ছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর ছাড়া যারা ছিলেন তাঁরা হলেন রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং আরও অনেকে।

বেথুন সোসাইটির অনুরোধে বিদ্যাসাগর সে সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করলে কেউ কেউ মনে করেছিলেন বিদ্যাসাগর হয়তো কোনো ইংরেজি গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করে পাঠ করছেন। কিন্তু ১৮৫৩ সালে ১২ই মার্চ 'সংবাদ প্রভাকরে' যে সংবাদ প্রকাশ করা হয় তাতে অনুবাদ গ্রন্থ পাঠের কোনো উল্লেখ ছিল না। সংবাদটি এরকম-

> "বীঠন সভায় মাসিক বৈঠকে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব প্রতিষ্ঠা সন্দীপন মূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্বাংশে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিপি নৈপুণ্য এবং সংস্কৃত বিদ্যার বিপুল বুৎপন্ন প্রদর্শনে এটি করেন নাই, যে মহাশয়েরা সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।"[১৬]

তাই আমাদের আর সন্দেহ রইল না যে বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায়ই গ্রন্থটি পাঠ করেছিলেন। পুস্তকটি যে ভাবে মুদ্রিত হয়েছিল, তাতে যে সংস্কৃত শ্লোক ছিল তা বাদ দিয়েও এক ঘন্টা সময় লাগত পাঠ করতে। তাই একঘন্টায় পাঠ শেষ করতে হবে জেনে তিনি সংক্ষেপে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করেছিলেন। বেথুন সোসাইটির সভাপতি ডাক্তার মৌয়াট সাহেবের অনুমতি পেয়ে বিদ্যাসাগর প্রথমে দুইশত পুস্তক মুদ্রিত করে বন্ধুদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগর সাহিত্যের বিবরণকে সময়ানুক্রমিক না করে বর্তমান প্রাসঙ্গিক ভাগে ভাগ করলেন। তার কারণ বাথুন সোসাইটির অনেকাংশই সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে খুব একটা পারদর্শী ছিলেন না। তাই বিদ্যাসাগর তাদের আকর্ষণ করার জন্য তাদের কাছে সর্বপ্রথম সংস্কৃত সদগ্রন্থের দৃষ্টান্ত দিলেন। বিদ্যাসাগর লিখেছেন-

> "সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত সর্ব প্রকার রচনাই সমান সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে। সংস্কৃত রচনাতে এ রূপ আসাধারণ প্রদর্শিত হইতে পারে যে তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।"[১৭]

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ভাষার উৎস এবং বিবর্তন কিছুটা ম্যাক্সম্যুলারের মতোই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার স্বরূপ এবং উৎপত্তি বা তার পরিনাম প্রভৃতি ধরণের অনেক আলোচনা বিদ্যাসাগরের বক্তৃতার পরে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ রচনার আগে এ ধরনের ভাষাতাত্বিক আলোচনার সৃষ্টি হয় নি। ভাষাতত্বের নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের জন্য তিনি পাশ্চাত্য পন্ডিতদের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আকৃষ্ট হন।

বিদ্যাসাগর সাহিত্যের গুরুত্বপুর্ণ শ্রেণী ধরেই আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি পৌরানিক যুগের সংস্কৃত সাহিত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করলেন। ১) দৃশ্যকাব্য ২) শ্রব্যকাব্য। তারপর এযুগের শ্রব্যকাব্যকে শ্রেণী উপশ্রেণীতে ভাগ করলেন, যেমন- মহাকাব্য, খন্ডকাব্য, কোষকাব্য, গদ্যকাব্য, চম্পুকাব্য। দৃশ্যকাব্যকে ছয় ভাগে ভাগ করলেন-কালিদাস, ভবভুতি, শ্রীহর্ষ, শূদ্রক, বিশকদেব, ভট্টনারায়ন।

বিদ্যাসাগর কাব্য পরিচয়ের ব্যাপারে সর্বদা অলংকার শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে নেন নি। নিজের যুক্তি বুদ্ধি অনুসারে তিনি বিচার বিশ্লেষন করেছেন, প্রয়োজনে সংস্কৃত কাব্যনাট্যেরও সমালোচনা করেছেন। কালিদাসের শকুন্তলা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অনুরাগ

প্রকাশ করেছেন। তিনি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ কে এক অলৌকিক পদার্থ বলে চিহ্নিত করেছেন। কালিদাসের প্রতি বিদ্যাসাগরের প্রচুর শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। কিন্তু কালিদাসের কাব্য ও নাটকের প্রশংসা করলেও তিনি কখন কখন ও কোন সংস্কৃত কবির যুক্তি পূর্ণ সমালোচনাও করেছেন।

গদ্যকাব্যের মধ্যে বিদ্যাসাগর বানভট্টের 'কাদম্বরী'র উচ্চ প্রশংসা করে বলেছেন-

> "ঐ অংশ এমন মনোহর যে বোধহয় কোনও দেশের কোনও কবি তদপেক্ষা অধিক মনোহর রচনা বা বর্ণনা করিতে পারেন নাই।"[১৮]

উত্তরচরিতের করুনরসের জন্য এবং সীতার চরিত্রের প্রতি আকর্ষিত হয়ে তিনি 'সীতার বনবাস' রচনা করছিলেন। হিতোপদেশের মধ্যে তিনি নানা অসংলগ্নতার উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ভাষা অনুশীলনে উৎসাহ থাকলেও সাধারণ ভারতবাসী 'বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হলে যে তাদের মনের কুসংস্কার কখনও গুছবে না একথা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। হিন্দি বাংলা প্রভৃতি ভাষা বা প্রাদেশিক ভাষা দ্বারা স্বরূপ উদ্ঘাটিত না হলে যে বিদ্যানুশীলন যথাযথ হবে না তাও তিনি বুঝেছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় ভাষা থেকে জ্ঞান অর্জন স্বরূপ কথা সংগ্রহ করে মাতৃভাষায় নিবন্ধ করতে হবে একথাও তাঁর মতো প্রগতিশীল ব্যক্তির মনেই জাগতে পারে।

সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে বিদ্যাসাগর পৌরাণিক যুগের সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সে কালের সংস্কার ত্যাগ করে আধুনিক যুক্তি বুদ্ধির দ্বারা নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পেরেছেন। কোথাও কোথাও আবার পুরাতন পণ্ডিতদের সমালোচনাও করেছেন।

১৮৬৯ সালে বিদ্যাসাগর রামের বনবাস বা রামের রাজ্যাভিষেক নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করলেন। ১৮৬০ সালে যখন সীতার বনবাস রচনা করলেন তখন তিনি বাল্মীকির রামায়ণের উত্তর কান্ড এবং ভবভূতির উত্তরচরিতের কিছু অংশ গ্রহন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মূল রামায়ণ থেকে ২য়, ৩য়, ৪র্থ স্বর্গ সম্পুর্ণ এবং ৫ম স্বর্গের কিয়দংশ নিয়ে রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কাহিনীর শুরু হয় দশরথের উক্তি দিয়ে-

> "আমি দীর্ঘ কাল আকন্টক রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করলাম। -------- সৌভাগ্যক্রমে চরম বয়সে সেই সর্বজন প্রার্থনীয় অনির্বচনীয় সুখের অধিকারী হইয়াছি, পুত্র অনেকের জন্মে, কিন্তু কোনও ব্যক্তি আমার মতো সৌভাগ্যশালী নহেন।"[১৯]

দশরথ কুলপুরোহিত ডেকে রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করলেন এবং রামচন্দ্র মাথা নীচু করে রাজ্যভার গ্রহন করলেন। সীতার বনবাসের তুলনায় রামের রাজ্যাভিষেকের ভাষা ছিল অনেক সহজ ও সরল। সীতার বনবাসে মধ্যে মধ্যে পুরনো ধরনের পদ ও শব্দ ছিল যার জন্য তার ভাষাকে গম্ভীর ও কৃত্রিম বলে মনে হয়। রামের রাজ্যাভিষেকের ভাষার মধ্যে শকুন্তলার ভাষার সরলতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

এর পর আর একটি ক্ষুদ্র বিচিত্র রচনা রচিত হয়েছিল যার নাম 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। একটি ছোটো বালিকার নাম প্রভাবতী, রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়ের কন্যা। তিন বৎসর বয়সের সময় বালিকাটির মৃত্যু হয়। বিদ্যাসাগর বালিকাটিকে কন্যাসম ভালোবাসতেন। বিদ্যাসাগর যখন মনের দিক দিয়ে বিপর্যস্ত থাকতেন তখন এই বালিকাটির শিশু সুলভ ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তোষ্ট হতেন। এই বালিকাটি যখন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তখন তিনি অসহ্য দুঃখ ভোগ করতে লাগলেন। তিনি বলেছেন-

> "জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে মানসিক দুঃখ কষ্টের সময়ে তাঁর যে একটি অবলম্বন ছিল তাও হারিয়ে গেল।"[২০]

সেই প্রভাবতীকে স্মরণ পুর্বক তিনি ছোটো যে নিবন্ধ রচনা করেন তার নাম 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। বিদ্যাসাগরের কোলেই প্রভাবতীর মৃত্যু হয়। পিপাসায় কাতর হয়ে জল চাইলেও চিকিৎসকের নিষেধ থাকায় তাকে জল দেওয়া হত না। এই কথা মনে পড়লে বিদ্যাসাগরের অন্তর কেঁদে উঠত। তিনি বলেছেন–

> "বৎসে! তুমি উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া, জল প্রার্থনা কালে, আমার দিকে, বারংবার, যে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, তাহা আমার হৃদয়ে বিষদগ্ধ শল্যের ন্যায় চিরদিনের নিমিত্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে। যদি তোমার সকল কান্ড বিস্তৃত হই, মর্মভেদী কাতর

> দৃষ্টিপাত, এক মুহুর্থের নিমিত্ত আমার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইবেক না। যদি তাহা বিস্মৃত হইতে পারি, তাহা হইলে আমার মত পামর ও পাষন্ড ভূমন্ডলে আর নাই।”[২১]

বিদ্যাসাগরের মনের ব্যথা দূর করার একমাত্র উপায় ছিল প্রভাবতী তাও অকালে হারিয়ে গেল। এই পুস্তক খানিতে বিদ্যাসাগর বিয়োগজনিত বিলাপের মাধ্যমে একটি মর্মবেদী রচনার পরিচয় রেখে গেছেন। এধরনের আন্তরিক রচনা বাংলা সাহিত্যে বড় বেশি লক্ষ করা যায় না।

বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর সারা জীবন সমাজ হিতকর কাজে এত ব্যস্ত ছিলেন যে আত্মকথা লেখারও সুযোগ পান নি। নানাজনের অনুরোধে তিনি আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেন ‘বিদ্যাসাগর চরিত’(স্বরচিত)। কিন্তু তিনি মাত্র দুটি অধ্যায় লেখার পর নানা কাজের চাপে ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য সেটি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। তাঁর তিরোধানের দু মাস পর তাঁর পুত্র নারায়নচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই দুটি পরিচ্ছেদই ‘বিদ্যাসাগর চরিত’ নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে প্রকাশ করেন। পুস্তকটিতে নারায়নচন্দ্র ক্ষুদ্র ভূমিকায় বলেন যে তাঁর পিতা সম্পুর্ণ জীবন চরিত লিখবেন ঠিক করেছিলেন, কারন তিনি যে জীবনচরিত লিখেছেন একথা বিদ্যাসাগরের আত্মীয়স্বজনদের কাছে শুনেছিলেন। তাই তাদের অনুরোধে নারায়নচন্দ্র আপাতত দুটি পরিচ্ছেদই প্রকাশ করলেন। প্রথম পরিচ্ছেদে বংশ পরিচয় এবং বিদ্যাসাগরের জন্ম থেকে চার বছর বয়স পর্যন্ত জীবন কথা বর্ণিত হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে তিনি পিতামহের কৌতুকের কথা বর্ণণা করতে বলেছেন-

> “আমার জন্ম সময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না; কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্ম সংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথি মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন, ‘একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে’। এই সময় আমাদের বাটীতে একটি গাই গর্ভিনী ছিল; তাহারও আজ কাল প্রসব হইবার সম্ভাবনা। এজন্য পিতামহদেবের কথা শুনিয়া পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব এড়েঁ বাছুর দেখিবার জন্য

> গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব 'ও দিকে নয়, এদিকে এস; আমি তোমায় এড়েঁ বাছুর দেখাইয়া দিতেছি'। এই বলিয়া সূতিকা গৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এড়েঁ বাছুর দেখাইয়া দিলেন।"[২২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি তাঁর বাল্যকালের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। আট বৎসর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে কলকাতায় আসলে পিতা পুত্র দুজনে বড়বাজারে ভগবতী সিংহের বাড়িতে আশ্রয় নেন। নিজের পিতামহীকে ছেড়ে এসে বিদ্যাসাগর ভগবতী সিংহের কন্যা রাইমনির কোলে স্থান পেলেন। এই মায়ের মত রমণীকে স্মরণ করে বিদ্যাসাগর বলেছেন-

> "এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি আমার হৃদয় মন্দিরে দেবী মূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে।"[২৩]

অতি অল্প বয়সে মাকে ছেড়ে এসে ঠাকুরমাকে ছেড়ে এসে বিদ্যাসাগর রাইমনির কাছে যে স্নেহ মমতা পেয়েছেন তা অভাবনীয়, সেকারণে সেই রমণীমূর্তি তাঁর হৃদয়ে স্থাপিত হয়ে রয়েছে।

এই পরিচ্ছেদে তিনি যখন কলকাতায় আসছিলেন তার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কলকাতায় আসার পথে সিয়াখালার বাঁধা রাস্তায় মাইল স্টোন দেখে তিনি ইংরেজী অঙ্ক কী ভাবে শিখলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ১৯এর মাইল স্টোন দেখে ১ ও ৯ শিখে ফেলেছিলেন। তার পর ১৮ থেকে ১০ পর্যন্ত মাইল স্টোন দেখে ইংরেজি রাশিগুলো শিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু সত্যিই শিখলেন কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর বর্ণনায় বলেছেন-

> "ইহার পরীক্ষা করবার নিমিত্ত, কৌশল করিয়া তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইল স্টোনটি দেখিতে দিলেন না; অনন্তর পঞ্চম মাইল স্টোনটি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন মাইলস্টোন বল দেখি। আমি দেখিয়া বলিলাম এই মাইল স্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে; এটি ছয় হইবেক, না হইয়া পাঁচ হইয়াছে।"[২৪]

তাঁর আত্মজীবনী বাংলা জীবনী সাহিত্যের একটি সম্পদ। দুঃখের বিষয় যে, বিদ্যাসাগর নানা কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকার কারণে আত্মজীবনী লেখার কোন সুযোগ পান নি, আর জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে যখন আত্মজীবনী লিখতে শুরু করলেন তখন তা আর সম্পূর্ন করতে পারলেন না। বাল্যজীবনের কাহিনি বলার মধ্যেই তাঁর জীবনের অবসান ঘটে গেল।

বিদ্যাসাগর এবং তাঁর রচনা নিয়ে যারা কুৎসা রটনা করেছিলেন, তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগর ছদ্মনামে কয়েকখানি পুস্তক লিখে সরস ব্যঙ্গের ভাষায় সমস্ত প্রতিবাদীদের অভিমতকে হাস্যকর বলে বিতর্ক রচনার সৃষ্টি করলেন লঘু রসের পরশ দিয়ে। বিদ্যাসাগর পান্ডিত্য ও অন্যান্য কাজ নিয়ে সর্বক্ষন ব্যস্ত থাকলেও তাঁর কৌতুকরস আমাদের অন্য এক বিদ্যাসাগরের পরিচয় দেয়। তিনি যে রঙ্গ ব্যঙ্গও জানতেন তার পরিচয় পাই আমরা তাঁর বেনামী রচনার মধ্যে। এই রচনাগুলি তাঁর প্রতিবাদীদের হাস্যস্পদ করার জন্য, এবং এর জন্যই তিনি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন, কারণ ছদ্মনামে লিখিত হলে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করতে সংকোচ থাকে না।

তিনি তিনটি ছদ্মনামে পাঁচখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন। (১) কস্যচিত উপযুক্ত ভাইপোস্য রচিত 'অতি অল্প হইল' ১৮৭৩সালে মে মাসে 'আবার অতি অল্প হইল' ১৮৭৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে, 'ব্রজবিলাস' ১৮৮৪ সালে নভেম্বর মাসে। (২) কস্যচিৎ তত্বান্বেষিন রচিত 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দু ধর্মরক্ষিনী সভা' ১৮৮৪ সালে নভেম্বর মাসে। (৩)কস্যচিত উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য প্রণীত 'রত্নপরীক্ষা' ১৮৮৬ সালে আগষ্ট মাসে।

রচনাগুলি বিদ্যাসাগর রচিত কিনা তাঁর কোন ভক্তের রচিত এনিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। কিন্তু এই পাঁচখানি পুস্তক যে বিদ্যাসাগরেরই রচনা এরও প্রমান পাওয়া যায়। পুস্তকগুলি প্রকাশিত হলে এটি বিদ্যাসাগরেরই রচনা বলে অনেকে অনুমান করেছেন। বিদ্যাসাগরও ধরা পরে গিয়ে তার সাফাই দিতে গিয়ে সুকৌশলে বলেন-

> "উপযুক্ত ভাইপোর পুস্তক পড়িয়া, অনেকে বেয়ারা খুশী হইয়াছেন, এবং উপযুক্ত ভাইপো লোকটা কে ইহা জানিবার জন্য অনেকে অতিশয় উৎসুক্য ও কৌতুহল জন্মিয়াছে। কেহ কহিতেছেন অমুক, অমুক, কেহ

> কেহ এতবড় সুবোধ যে বিদ্যাসাগরকে উপযুক্ত ভাইপোর জায়গায় বসাইতেছেন।"[২৫]

বিদ্যাসাগর ছদ্মনামে প্রথম তিনখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন তার প্রথম দুখানি পুস্তককে আক্রমন করেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি। ১৮৭৩ সালে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' গ্রন্থে বিদ্যাসাগর তারানাথের সংস্কৃত গ্রন্থ 'বহুবিবাহবাদ' গ্রন্থের প্রচুর ভূল ভ্রান্তি ধরেছিলেন। প্রতি পক্ষের ভূল ভ্রান্তি প্রকাশ করলে তর্কের ক্ষেত্রে সেই ছিদ্রপথ অবলম্বন করা যায়। বিদ্যাসাগর সে রীতি অনুসারে 'অতি অল্প হইল' পুস্তিকাতে তারানাথের বৈয়াকরণীয় জাঁক ভাঙ্গতে চেয়েছেন এবং সমাজে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

'অতি অল্প হইল' প্রকাশের তিন মাস পর তাঁর ছদ্মনামে দ্বিতীয় পুস্তক 'আবার অতি অল্প হইল' প্রকাশিত হয়। তারানাথ ভাইপোর প্রথম আক্রমনেই বিপর্যস্ত হয়ে বৈয়াকরণীয় প্রয়োগ সমর্থন করলেন। পুস্তক দুটিতে বহুবিবাহ বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ নেই। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে বলেছেন-

> "এই দুই পুস্তিকায় ব্যাকরণের অতি প্রাজ্ঞ বলে খ্যাত তারানাথের গুমর ফাঁক করবার জন্য ভাইপো কিঞ্চিৎ চাপা খেউড় ধরেছিল।"[২৬]

তৃতীয় পুস্তক 'ব্রজবিলাস' কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য নামেই প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক প্রকাশের পিছনে একটি বিশেষ কারণ থাকাতে অসুস্থ বিদ্যাসাগর ভাইপোর বেশ ধারণ করেছিলেন।

সমাজে যখন বহুবিবাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ চলছিল তখন বিদ্যাসাগর নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়, প্রমানের চেষ্টায় চদ্মনামে ব্যঙ্গবিদ্রুপের মাধ্যমে আক্রমন চালালেন এবং আক্রমন করলেন 'যশোহর হিন্দু ধর্মরক্ষিনী সভা'র উপর। বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্ম রক্ষিনী সভা' দ্বিতীয় সংস্করণ 'বিনয়পত্রিকা' নামে প্রকাশিত হয় এবং তিনি হিন্দুধর্ম রক্ষিনী সভার সম্পাদক তারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমন করেন। তিনি বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়

একথা প্রমান করার চেষ্টা করেছেন, এতে তিনি কটুবাক্য ব্যবহার না করে তত্ব সন্ধানই করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের পঞ্চম পুস্তক 'রত্নপরীক্ষা' পুস্তকে তিনি তিন ধরনের রত্ন দিয়ে প্রস্তুত বিধবাবিবাহ নিষেধক পুস্তকের রচনাকার ও উৎসাহদাতাকে আক্রমন করেন। তাঁর বিধবাবিবাহ প্রবর্তক পুস্তকটি প্রকাশের বিষ বছর পর স্মৃতিরত্ন মধুসূদন তাঁকে আক্রমন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ছদ্মনামে মধুসূদনের যুক্তির উপর প্রতিযুক্তি দিয়েছিলেন। এই পুস্তকখানিতে বিদ্যাসাগর মধুসূদনের মত ও মন্তব্যকে খন্ড করে দেন। মধুসূদনের বিধবাবিবাহ বিবাদ পুস্তকটি মতামতের জন্য মহেন্দ্রচন্দ্রকে পাঠিয়ে মনে করেছিলেন মহেন্দ্রচন্দ্র তাঁর তারিফ করবেন, কিন্তু মহেন্দ্রচন্দ্র মধুসূদনের ভুলত্রুটি ব্যাখ্যা করে তার চিঠির মতামতকে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যে সকল মন্তব্য করেন তাতে মধুসূদনের সম্মান কমেছে বই বাড়ে নি।

বিদ্যাসাগর তাঁর বেনামী পুস্তকগুলির রচনা করার সময় তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন সত্যিই কিন্তু তাঁর মনটি তখনও বেশ সরস সজীব ও কৌতুকপ্রবন ছিল। অন্য আঘাতে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর প্রসন্ন হৃদয়টি শুকিয়ে যায় নি। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য এই পুস্তকগুলি আজও জনপ্রিয়।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে যতি সন্নিবেশ করে পদবন্ধে ভাগ করে সুললিত শব্দ ব্যবহার করে তথ্যের ভাষাকে রসের ভাষায় পরিণত করেন। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য-

> "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন, এবং সুসংগত করিয়া তাহাকে সহজাগতিক এবং কার্য কুশলতা দান করিয়াছেন-এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন-কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনা কর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথম তাঁহাকে দিতে হয়।"[২৭]

বিদ্যাসাগরের অমূল্য দান আজ সারাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। বিদ্যাসাগর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

শেষ বয়সে বিদ্যাসাগর মানসিক ও শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। একজন মানুষ যখন বেঁচে থাকে তখন তাঁর উপযুক্ত মূল্যায়ন আমরা করি না বা করে উঠতে পারি না। বিদ্যাসাগরের মতো এত বড় সিংহপুরুষের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। যে মানুষটি সারাটা জীবন সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করে গেলেন, সে মানুষটির শেষ জীবন খুব একটা ভাল কাটেনি। সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর সমাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে সভ্য সমাজের নাগরিক বিলাসিতা ত্যাগ করে বিহারের অন্তর্গত কার্মাটারে আদিবাসী সমাজে সাঁওতাল মানুষদের সঙ্গে কাটাতে হয়েছিল। সাঁওতালদের অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি সাঁওতালদের জন্য একটি স্কুলও স্থাপন করেছিলেন। অবশেষে ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই তিনি পরলোক গমন করেন। বিদ্যাসাগর যদিও আজ নেই তবুও ভারতবর্ষের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মনের মনিকোঠায় তিনি চিরকাল থাকবেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনে যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তার কালানুক্রমিক রচনাবলী উল্লেখিত হল-

1. বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭খ্রীষ্টাব্দে)
2. বাঙ্গালার হতিহাস, ২য় ভাগ(১৮৪৮খ্রীষ্টাব্দে)
3. জীবনচরিত(১৮৪৯)
4. বোধদয়-শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ(১৮৫১)
5. সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমনিকা(১৮৫১)
6. ঋজুপাঠ-প্রথম ভাগ(১৮৫১)

   দ্বিতীয় ভাগ(১৮৫২)

   তৃতীয় ভাগ(১৮৫২)

7. ব্যাকরণকৌমুদী-প্রথম ভাগ(১৮৫৩)

   দ্বিতীয় ভাগ(১৮৫৩)

   তৃতীয় ভাগ(১৮৫৪)

   চতুর্থ ভাগ(১৮৬২)

8. সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব(১৮৫৪)
9. শকুন্তলা(১৮৫৪)
10. বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব(১৮৫৫)
11. বর্ণপরিচয়- প্রথম ভাগ(১৮৫৫)

    দ্বিতীয় ভাগ(১৮৫৫)

12. বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব-দ্বিতীয় পুস্তক(১৮৫৫)
13. কথামালা(১৮৫৬)
14. চরিতাবলী(১৮৫৬)
15. মহাভারত উপক্রমনিকা ভাগ (১৮৬০)
16. সীতার বনবাস(১৮৬০)
17. আখ্যান মঞ্জরী(১৮৬৩)
18. শব্দমঞ্জরী(১৮৬৪)
19. ভ্রান্তিবিলাস(১৮৬৯)
20. বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার(১৮৭১)
21. বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার- দ্বিতীয় পুস্তক(১৮৭৩)
22. পদ্যসংগ্রহ- প্রথম ভাগ(১৮৮৮)

    দ্বিতীয় ভাগ(১৮৯০)

23. নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস(১৮৮৮)
24. সংস্কৃত রচনা(১৮৮৯)

25. শ্লোকমঞ্জরী(১৮৯০)
26. বিদ্যাসাগর চরিত-স্বরচিত(১৮৯১)
27. ভূগোল খগোল বর্ণণম্(১৮৯২)

বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনাগুলি হল-

1. অতি অল্প হইল(১৮৭৩)
2. আবার অতি অল্প হইল(১৮৭৩)
3. ব্রজবিলাস(১৮৮৪)
4. বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভা(১৮৮৪)
5. রত্নপরীক্ষা(১৮৮৬)

এই গ্রন্থ গুলি ছাড়াও বিদ্যাসাগর আরও কিছু গ্রন্থের সম্পাদনা করেছিলেন।

তথ্যসূত্র-

1. বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১।
2. ঐ পৃষ্ঠা ১১।
3. ঐ পৃষ্ঠা ১১।
4. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সুবোধ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১২৩।
5. বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৮৭।
6. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সুবোধ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ১০৭৭।
7. ঐ পৃষ্ঠা ৫৫৯।
8. ঐ পৃষ্ঠা ৫৫৫।
9. ঐ পৃষ্ঠা ৫৫৬-৫৫৭।
10. ঐ পৃষ্ঠা ৫৫৭।
11. সমকালে বিদ্যাসাগর, স্বপন বসু, পৃষ্ঠা ১৭।
12. বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগর, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৩।
13. বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, বিনয় ঘোষ, পৃষ্ঠা ২৭৯।
14. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সুবোধ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৭০৯।
15. বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৬।
16. ঐ পৃষ্ঠা ১৭৯।
17. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সুবোধ চক্রবর্তী পৃষ্ঠা, ৭৪।
18. ঐ পৃষ্ঠা ৯১-৯২।
19. বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯২।
20. ঐ পৃষ্ঠা ১৯৩।
21. বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সুবোধ চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ৩৪৩-৩৪৪।
22. ঐ পৃষ্ঠা ৩২৫।
23. ঐ পৃষ্ঠা ৩৩৫।

24. ঐ পৃষ্ঠা ৩৩৮।

25. ঐ পৃষ্ঠা ৯০৯।

26. বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২১১।

27. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩১১।

****